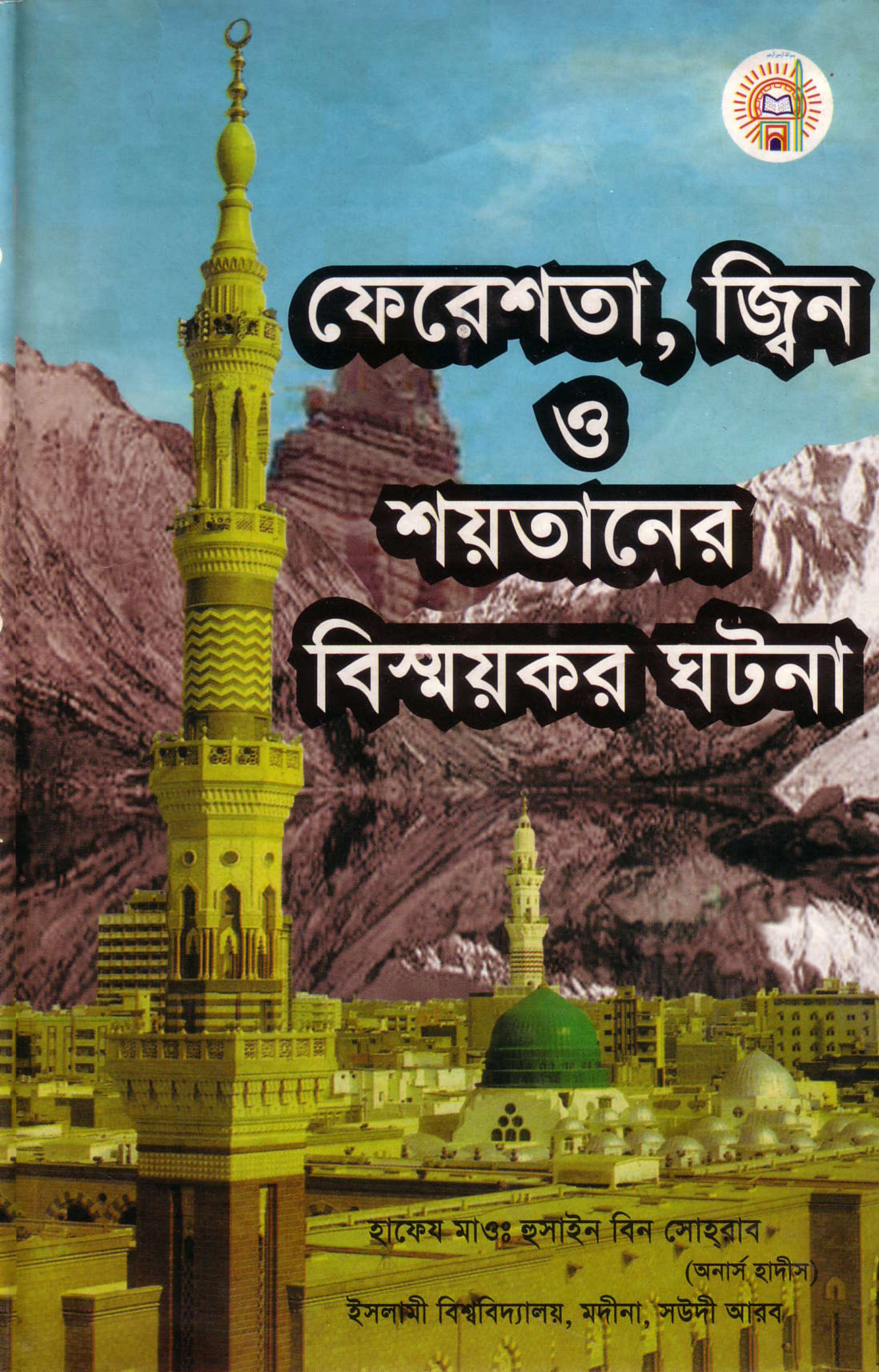


ফেরেশতা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা

হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব

ফেরেশতা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স-হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা
সৌদী আরব।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে ফেরেশতা, জ্বিন ও শয়তানের ইতিহাস বইখানা প্রকাশ হওয়াতে তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং দরুদ ও সালাম পাঠ করছি আমাদের শ্রেষ্ঠ রাসূল মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞

আমি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে। (সূরা ঃ আয্-যারিয়াত- ৫৬)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির মূল রহস্য হল ইবাদাত বন্দেগী।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্যান্য সব কিছুকেই মানুষের কল্যাণ এবং তাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۞

তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছে।
(সূরা ঃ আল-বাকারা- ২৯)

ফেরেশতাগণ সর্ব প্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র; এজন্য তাদের থাকার জায়গা আকাশেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষই আল্লার সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি। মানুষকে আশরাফুল মাখলূক্বাত বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আক্বল-বুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনার বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন তাই স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এসব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর রহস্য কি? কেন তিনি এ সব সৃষ্টি করলেন? এ পুস্তকে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব ইনশাআল্লাহ।

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।-ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চষ্টা করব।

খাদিম
হুসাইন বিন সোহরাব (আবূ নুফাই)

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জিবরাঈল (আঃ)-এর পরিচয় ও কর্ম

নাবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা হলেন– জিবরাঈল (আঃ); তাঁর অপর নাম রূহ ও রূহুল আমীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۞

"আল্লাহ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণী বাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। আল্লাহ সব কিছু দেখেন ও শুনেন।" (সূরা ঃ হাজ্জ– ৭৫ আয়াত)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ : فَجِئْتُ اَنْظُرُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ : مَالَكَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ قَالَ : اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ : اَلَا اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ۞

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) বলেন ঃ "একদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বেরিয়ে খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন, অতঃপর এমন একটি দীর্ঘ সিজদায় উপনীত হলেন যে, আমার ভয় হল না জানি আল্লাহ তাঁর রূহ কব্‌য করে নিলেন। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে ছিলাম এর মধ্যেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ "কি হলো?" আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কথা জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন ঃ "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আপনাকে এ সুসংবাদ দেবনা? আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠ করবে আমিও তার প্রতি সালাম বা শান্তি দান করব।" (মুসনাদ আহমাদ)

কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার উপস্থিত করতে আদেশ করলেন। আমরা তা উপস্থিত করলাম। অতঃপর যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলেন, তখন বললেন ঃ "আমীন।" দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ পূর্বক বললেন ঃ "আমীন।" পরে তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করে বললেন ঃ "আমীন।" অতঃপর খুতবা শেষ

করে যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বার থেকে নেমে নীচে তাশরীফ আনলেন তখন সাহাবাগণ আরয করলেন ঃ "আজ আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনিনি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) তাশরীফ এনে আমাকে বললেন ঃ "ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য; যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল অথচ স্বীয় গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না। আমি তার উত্তরে বললাম– আমীন। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি কবূল কর। পরে যখন আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলাম, তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যার সামনে আপনার (মুহাম্মাদ) নাম নেয়া হয়, অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। আমি উত্তরে বললাম– "আমীন।" যখন তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলাম, তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতা দু'জনকে অথবা তাঁদের যে কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাঁদের খিদমাত করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না। আমি জবাবে বললাম– "আমীন।" (হাকিম)

কয়েকজন ফেরেশতার কাজ-কর্ম

জীবিকা বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা মীকাঈল (আঃ)। সকল জীবন বা রূহ কবচ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আযরাঈল (আঃ)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ۞

অর্থাৎ– "বলুন! তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে।" (সূরা ঃ সাজদা– ১১)

কিয়ামাতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার জন্য নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীল (আঃ)। তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ কিয়ামাত কায়েম হবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করার জন্য মুনকার-নকীর দু'ই ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন।

দোযখের রক্ষক ফেরেশতার নাম মালিক এবং বেহেশতের যিম্মাদার ফেরেশতার নাম রিয্ওয়ান।

এমনিভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন

আল্লাহ বলেন ঃ

وَانَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞

অর্থাৎ– "অবশ্যই তোমাদের জন্য নিয়োজিত আছে হিফাযাতকারী (ফেরেশতাগণ) সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ, তারা জানে তোমরা যা কর তা।" (সূরা ঃ ইনফিতার– ১০-১২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۞

অর্থাৎ– "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা ঃ কাফ– ১৮)

রাসূলের নিকট দরূদ ও সালাম প্রেরণ

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَلْيُقِلَّ أَوْ يُكْثِرْ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ الْقَاضِيْ فِيْ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমের ইবনু রাবি'আহ (রাঃ)-এর পিতা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠ করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাকুল তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। অতএব যে চায় কম পড়ুক, আর যে চায় অধিক পরিমাণে পড়ুক।" (ইবনু মাজাহ)

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِيْ فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِيْ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ الْمَلَكُ : يَامُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ ❊

আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ "তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ কর। আল্লাহ তা'আলা আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যখনই আমার কোন উম্মত আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, তখনই এই ফেরেশতা আমাকে বলবে– হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি অমুক সময় দরুদ পাঠ করেছে।" (দায়লমী)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِىْ الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ ※

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছানোর জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। যে (ফেরেশতা) যমীনে ঘুরা-ফেরা করতে থাকেন।" (নাসায়ী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ※

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ তার নামাযের জায়গায় অর্থাৎ যেখানে সে নামায পড়েছে, সেখানে বসে থাকে, আর তার অযূ নষ্ট না হয়, ততক্ষণ ফেরেশতা তার প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকে এবং বলতে থাকে– হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন! তাঁর প্রতি রহম করুন। (বুখারী)

জান্নাত ও জাহান্নামের ফেরেশতাদের বাণী

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ـ حَتّٰى اِذَا جَاءُوْ

هَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـ قَالُوْا

بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ◈

"কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন এর প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে– তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তিলাওয়াত করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।" (সূরা ঃ আয্-যুমার– ৭১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا

وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا

خَالِدِيْنَ ۞

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের দ্বাররক্ষী (ফেরেশতাগণ) তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম; তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য।"

(সূরা ঃ আয্-যুমার- ৭৩)

আল্লাহর আরশ ধারণকারী ফেরেশতা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۞

"এবং তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।" (সূরা ঃ আয্-যুমার- ৭৫)

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ

"ফেরেশতাগণ তার কিনারায় এসে পড়বে; আর সেদিন আপনার প্রভুর আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করে থাকবে।" (সূরা ঃ হাক্কাহ্- ১৭)

কবরে মুনকীর-নাকীর ফেরেশতার প্রশ্ন

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুনকির-নাকীর যখন কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করবে مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দ্বীন কি? কাফির বলবে هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু'মিন বলবে, اَللّٰهُ رَبِّىْ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ। আমার প্রতিপালক, আল্লাহ্ এবং আমার দ্বীন ইসলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফিরও মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন বান্দাকে তার কবরে

রাখা হয় এবং তার সঙ্গি-সাথীরা সেখান থেকে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় (অর্থাৎ তারা ফিরতে না ফিরতেই) তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে পৌছেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর (রসূলের প্রতি ইশারা করে) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি দুনিয়াতে এব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করতে? মু'মিন বান্দা তখন বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল। তখন তাকে বলা হয় ঃ এই দেখে নাও, দোজখে তোমার স্থান কিরূপ (জঘন্য) ছিল। আল্লাহ তা'আলা তোমার সে স্থানকে বেহেশতের স্থানের সাথে বদলিয়ে দিয়েছেন; তখন সে তার উভয় স্থানই দেখে (এবং পার্থক্য দেখে খুশী হয়)। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির– যখন তাদের প্রত্যেককে বলা হয় ঃ দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে ঃ আমি বলতে পারি না (প্রকৃত সত্য কি ছিল), মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয় ঃ (বুঝলাম) তুমি তোমার বিবেক দ্বারাও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং (আল্লাহর কিতাব) পড়েও জানতে চেষ্টা করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাঁতুড়ি দিয়ে কঠিনভাবে পিটাতে থাকে, এতে সে বিকটভাবে চীৎকার করতে থাকে, যা জ্বিন ও মানুষ ছাড়া তার আশে পাশের সকলেই শুনতে পায়। (বুখারী)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মুর্দা কবরে পৌছে,

(নেক) ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন ও মন্দের ভাবনামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়– তুমি কোন্ দ্বীনে ছিলে? তখন সে বলে ঃ আমি দ্বীন ইসলামে ছিলাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হয়– এ ব্যক্তি কে? সে বলে ঃ ইনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল প্রমাণসহকারে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরাও তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনেছিলাম। আবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়– তুমি আল্লাহকে দেখেছ কি (যাতে তুমি আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস করলে)? সে উত্তরে বলে ঃ দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য দোজখের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হয়। সে ওদিকে নজর করে এবং দেখে, আগুনের ফুলকীসমূহ একে অন্যকে দলিত মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ, তোমাকে কেমন বিপদ হতে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়; তখন সে বেহেশতের সুন্দর্য এবং তাতে যা (আরামের বস্তু) রয়েছে তার প্রতি নজর করে। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ এটাই তোমার স্থান। কেননা, তুমি দুনিয়ায় ঈমানের সাথে ছিলে এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছ। ইনশাআল্লাহ এই ঈমানের সাথেই তুমি কিয়ামাতের দিন উঠবে। পক্ষান্তরে বদ ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে উঠে বসে ভীত সন্ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়– তুমি কোন্ দ্বীনে ছিলে? সে উত্তরে বলে ঃ আমি কিছুই

জানি না। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ এ ব্যক্তি কে? সে উত্তর করে ঃ তার সম্পর্কে মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। অতঃপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়; সে সেই পথ দিয়ে বেহেশতের সুন্দর্য ও তাতে যা (সুখ শান্তির বস্তু) রয়েছে তার প্রতি নজর করে। তখন তাকে বলা হয়– দেখ, আল্লাহ তোমা হতে কি সব নি'আমত দূরে রেখেছেন। এরপর তার জন্য দোজখের দিকে একটা পথ করে দেওয়া হয়; সে তার প্রতি নজর করে এবং দেখে, আগুনের ফুলকীসমূহ একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়– এটাই তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, সন্দেহের উপরই মরেছো। ইনশাআল্লাহ এই সন্দেহের উপরই কিয়ামাতের দিন তোমাকে উঠান হবে। (ইবনু মাজাহ)

খচ্চরের কবরের আজাব শ্রবণ

জায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম– হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং রাসূলকে প্রায় মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, ৫ কি ৬টি কবর রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এই কবরবাসীদেরকে কে চিনে?" এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ "আমি চিনি ইয়া রাসূল!" রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এরা কবে মরেছে?" সে উত্তর করল ঃ "শিরকের জামানায়। তখন রাসূল বললেন ঃ "এই উম্মাত তথা মানুষ তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় পড়ে (এবং শাস্তি ভোগ করে)। অতঃপর ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেওয়া ত্যাগ করবে, তা না হলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরও কবরের আজাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি।" অতঃপর রাসূল আমাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ "তোমরা সকলে দোজখের আজাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।" তারা বলল ঃ "আমরা কবর আজাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি।" রাসূল বললেন ঃ "আবার তোমরা সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন ফিৎনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।" সকলেই বললেন ঃ "আমরা সমস্ত ফেৎনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি যা প্রকাশ্য আছে ও যা গোপন রয়েছে।" আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এবার তোমরা দাজ্জালের ফেৎনা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।" সকলে বলল ঃ "আমরা দাজ্জালের ফেৎনা হতেও আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

(মুসলিম)

রামাযানে শয়তানকে বন্দি রাখা ও রহমতের ফেরেশতা প্রেরণ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রামাযান মাসের প্রথম রাত হতে সমস্ত শয়তানকে জেলখানার কাল কুঠরিতে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাদের দুর্ধর্ষ বদমাশগুলোকে লৌহ শিকল দিয়ে কঠিনভাবে আবদ্ধ করা হয়। দোযখের দরোজাগুলো এমনভাবে বন্ধ করা হয় যে, রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা আর খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরোজাগুলো এমনভাবে খোলা হয় যে, রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার আর বন্ধ করা হয় না। ফেরেশতার দল মানব গোষ্ঠিকে আহ্বান করতে থাকে যে, যারা আল্লাহর রহমতের আশাধারী তোমরা তাড়াতাড়ী আল্লাহর রহমতের দিকে অগ্রসর হও। আর যারা পাপাচারী পাপাসক্ত মহাপাপী তারা একটু দাড়াও, ক্ষান্ত হও। মহান আল্লাহ অনেকগুলো মানুষকে এই রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে দোযখের ভয়াবহ অগ্নিথেকে মুক্ত করে দেন।

(তিরমিযী)

মুসলমানদের বৎসরে দু'টি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ঈদুল ফিতরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু বিলম্ব করে ঈদের নামাজ পড়তেন আর ঈদুল আজহার পূর্বাকাশে সূর্য উঠার সাথে সাথে নামাজ আদায় করতেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে প্রভাত হওয়া মাত্রই অগণিত ফেরেশতার দল রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকে ঃ হে মুসলিম সমাজ! তোমরা অফুরন্ত দয়ার সাগর মহান আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও। তোমাদেরকে তিনি অফুরন্ত বিনিময় প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছেন। তোমাদেরকে রাত্রে ইবাদতের জন্য বলা হয়েছিল তা তোমরা পূরণ করেছ। আর তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখতে বলা হয়েছিল তাও তোমরা পূরণ করেছ। এখন তোমরা আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাজের বিনিময় গ্রহণ কর। যখন নামাজ পড়া হয়ে যায় তখন ফেরেশতার দল আসমান হতে উচ্চস্বরে চিৎকার করে ডাক দিতে থাকে আর বলতে থাকে, তোমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তোমরা এখন মাগফিরাত নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আজকের দিন বান্দাদের প্রতিদান দেওয়ার দিন। আসমানের সে দিবসের নাম রাখা হয় ইয়াওমুল জায়িজাহ প্রতিদান দেওয়ার দিন।

(তাবারানী)

ফেরেশতাদের দায়িত্ব বণ্টন

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ※

অর্থাৎ "মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।" অর্থাৎ মানুষের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে তাদের চতুর্দিকে ফেরেশতাদের মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। তাঁরা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন তাদের কার্যাবলী পরিদর্শন করার জন্য ফেরেশতাদের অন্য দল রয়েছে। যাঁরা পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসা যাওয়া করে থাকেন। রাতের জন্য পৃথক ফেরেশতা আছেন এবং দিবসের জন্য পৃথক ফেরেশতা রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা মানুষের আমাল লিখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের ফেরেশতা পুণ্য লিখেন এবং বাম দিকের ফেরেশতা পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পেছনে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চারজন ফেরেশতার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমাল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পেছনে। তারপর রাত্রির পৃথক ও দিবসের পৃথক। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ "তোমাদের কাছে ফেরেশতারা পালাক্রমে আগমন করে থাকেন দিনে ও রাতে। ফজর ও আসরের নামাযে উভয় দলের মিলন ঘটে। রাত্রে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ রাতের শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি

অবস্থায় ছেড়ে এসেছো?" তাঁরা উত্তরে বলেন– "আমরা তাদের কাছে আগমনের সময় নামাযের অবস্থায় তাদের পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদের নামাযের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।" (ইবনু কাসীর)

অন্য হাদীসে এসেছে ঃ "তোমাদের সাথে তাঁরা রয়েছেন যাঁরা তোমাদের পায়খানা ও সহবাসের সময় ছাড়া কোন অবস্থাতেই তোমাদের থেকে পৃথক হন না। সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁদের থেকে লজ্জা করা ও তাঁদেরকে সম্মান করা।"

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন একজন জ্বিন ও একজন ফেরেশতা।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথেও কি?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "হাঁ, আমার সাথেও রয়েছেন। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া কিছুই হুকুম করে না।" (মুসনাদ আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "রাতের ও দিনের ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আসতে রয়েছেন। ফজর ও আসরের সময় তাঁদের (দু'দলের দলের) মিলন ঘটে যায়। তোমাদের মধ্যে ফেরেশতাদের যে দলটি রাত অতিবাহিত করেন তাঁরা যখন আকাশে উঠে যান তখন আল্লাহ তা'আলা খবর রাখা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো?" তাঁরা উত্তরে বলেন ঃ "আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তাঁরা নামাযে রয়েছে, ফিরে আসার সময়েও তাঁদেরকে নামাযের অবস্থাতেই ছেড়ে এসেছি।" (বুখারী, মুসলিম)

ফেরেশতাদের ইবাদত

হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ "আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি?" তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন ঃ "আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি আকাশের চড় চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর আকাশ চড় চড় কেন করবে না? তাতে আধহাত পরিমাণও জায়গা এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদা বা দাঁড়ানো অবস্থায় বিদ্যমান না রয়েছেন।" (ইবনু আবী হাতিম)

হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন– "আমি যা শুনছি তা তোমরাও শুনছো কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা!" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি আকাশের চড় চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর আকাশকে তার এই চড় চড় শব্দের জন্যি তিরস্কার করা যায় না। কেননা ফেরেশতা এতো বেশী রয়েছেন যে, আকাশের মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ এমন জায়গাও ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা রুকূ' অথবা সিজদা অবস্থায় না আছেন।" (ইবনু কাসীর)

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর সাথীদেরকে বললেন ঃ "আসমান চড় চড় শব্দ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে ওর এরূপ শব্দ করাই উচিত। কেননা, ওর এমন কোন স্থান ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেশতাদের কেউ না কেউ রুকূ' বা সিজদারত অবস্থায় থাকেন না।" অতঃপর তিনি وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ হতে وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ পর্যন্ত আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করেন।

(ইবনু আবী হাতিম)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন ফেরেশতা সিজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন। (ইবনু কাসীর)

হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাজলিসে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় তিনি বললেন ঃ "আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা তোমরাও শুনতে পাচ্ছ কি?" সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ "আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।" তখন তিনি বললেন ঃ "আমি আকাশের চড়চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর সত্য ব্যাপার তো এটাই যে, ওতে চড়চড় শব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা তাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতার মাথা সিজদায় পড়ে থাকে না।"(ইবনু আবী হাতিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মা'মূরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রতিদিন পালাক্রমে সত্তর

হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে তাঁরা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। কিন্তু ফেরেশতাদের সংখ্যা এতো অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত আর তাঁদের ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা পড়বে না।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না এবং আমি এমন কিছু শুনছি যা তোমরা শুনো না। আকাশ চড় চড় শব্দ করছে এবং তার চড় চড় শব্দ করার অধিকার রয়েছে। এমন চার অঙ্গুলী পরিমাণ জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদায় পতিত থাকেন না। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। আর তোমরা বিছানায় তোমাদের স্ত্রীদের সাথে প্রেমালাপ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে পারতে না, বরং ক্রন্দন ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে যেতে!" এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বললেন ঃ "আমি যদি গাছ হতাম এবং আমাকে কেটে ফেলা হতো (তবে কতই না ভাল হতো)!" (তিরমিযী, আহমাদ)

আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু নাওফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "একদা আমি কা'ব আহবার (রাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। ঐ সময় আমি অল্প বয়সের বালক ছিলাম। আমি তাঁকে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলাম যে, ফেরেশতাদেরকে কি তাঁদের চলা-ফেরা, আল্লাহর পায়গাম

নিয়া যাওয়া, আমল করা ইত্যাদি ও তাসবীহ্ পাঠ করতে বিরত রাখেন? আমার এ প্রশ্ন শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ ছেলেটি কে?" জনগণ উত্তরে বললেন ঃ "এটা বানু আবদিল মুত্তালিব গোত্রের ছেলে।" তিনি তখন আমার কপাল চুম্বন করে বললেন ঃ "হে প্রিয় বৎস! ফেরেশতাদের এই তাসবীহ্ পাঠ ঠিক আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণের মত। দেখো, চলতে-ফিরতে, কথা বলতে সব সময়েই আমাদের নিঃশ্বাস আসা-যাওয়া করে থাকে। অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের তাসবীহ্ পাঠও অনবরত চলতে থাকে।"

(ইবনু কাসীর)

সূরা আম্বিয়ার ১৮ আয়াতের শেষাংশ ও ১৯ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত ঃ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে, (অর্থাৎ, ফেরেশতা) তাঁরা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদাতে মাশগুল থাকে। মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদাত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদাতে এ দু'টি আন্তরায় নেই। তারা ইবাদাতে অহংকারও করে না যে, ইবাদাতকে পদমর্যাদার খিলাফ মনে করবে এবং ইবাদাতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত-দিন তাসবীহ্ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করে না।

কীয়ামাতের দিন ফেরেশতারা যা বলবেন

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সপ্ত আকাশে পা পরিমিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত এবং হাতের তালু পরিমিত এমন জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা কিয়াম, রুকূ' অথবা সিজদারত অবস্থায় না রয়েছেন। অতঃপর কাল কিয়ামাতের দিন তাঁরা সবাই বলবেন ঃ "(হে আল্লাহ্!) আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদাত করতে পারিনি। তবে (এ কথা সত্য যে,) আমরা আপনার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করিনি।" (তিবরানী)

আদী ইবনু ইরতাত (রহঃ) মাদায়িনের জামে মাসজিদে তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আমি একজন সাহাবী (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার এমন বহু ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা আল্লাহর ভয়ে সদা প্রকম্পিত থাকেন। তাঁদের চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ঐ অশ্রু ঐ ফেরেশতাদের উপর পরতে থাকে যাঁরা নামাযে নিমগ্ন থাকেন। তাঁদের মধ্যে এমন ফেরেশতাও রয়েছেন যাঁরা দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে রুকূতেই রয়েছেন এবং অনেকে সিজদাতেই রয়েছেন। কিয়ামাতের দিন তাঁরা তাদের পিঠ ও মাথা উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলা নিকট আরয করবেন ঃ "আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদাত করতে পারিনি।" (ইবনু কাসীর)

ফেরেশতাদের আবেদন

ইবনু আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন– ফেরেশতাগণ বলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন এবং বানূ আদমেরও সৃষ্টিকর্তা আপনিই। তাদেরকে আপনি খাদ্য ও পানীয় দান করেন। তারা কাপড় পরিধান করে থাকে, বিয়ে-শাদী করে, তাদের জন্য সাওয়ারী রয়েছে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা সুখ ও আরাম ভোগ করছে। আমরা এগুলো হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছি। দুনিয়ায় যখন তাদের জন্য এগুলো রয়েছে তখন আখিরাতে আমাদেরকে এগুলো দান করুন!" তাঁদের এই প্রার্থনার জবাবে মহান আল্লাহ বললেন ঃ "যাকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি এবং যার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছি তার সমকক্ষ আমি ওদেরকে করবো না যাদেরকে আমি বলেছি ঃ 'হও' আর তেমনই হয়ে গেছে।"

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত; ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আদম সন্তানের জন্য আপনি দুনিয়া বানিয়েছেন, সেখানে তারা পানাহার করে থাকে এবং বিয়ে-শাদী করে থাকে। সুতরাং আখিরাত আপনি আমাদের জন্যই করুন।" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "আমি এরূপ করবো না।" ফেরেশতারা তিনবার প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "যাকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে কখনো তাদের মত করবো না– যাদেরকে আমি শুধু "كُنْ" শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" (ইবনু আবী হাতিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে?" তাঁরা বলেন ঃ "ফেরেশতাগণ।" তিনি বললেন ঃ "তাঁরা ঈমান আনবেন না কেন? স্বয়ং তাদের উপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে।" সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ "অতঃপর আমরা।" তিনি বললেন ঃ "তোমরা ঈমান আনবে না কেন? স্বয়ং আমি তো তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি।" তখন তাঁরা বলেন ঃ "দয়া করে আপনিই বলুন!" তিনি বললেন ঃ "সবচেয়ে ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা গ্রন্থে লিখিত পাবে এবং ওর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (ইবনু কাসীর)

জ্বিনদের পরিচয়

তাফসীরে মাযহারী থেকে প্রমাণিত ঃ জ্বিন আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার শরিরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। মানব সৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মাটি; তেমনি জ্বিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ আগুন। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, সাধারণত তারাও জ্বিনদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর নাম। জ্বিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত এটা অস্বীকার করা কুফর। (মাযহারী)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, জ্বিনদের সংখ্যা ছিল সাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তিনজনকে হিরানের অধিবাসী ও চারজনকে নাসীবাইনের অধিবাসী বলেছেন। তাদের নামগুলো হলো হিসসী, হিসসা, মিনসী, সা'সির, নাসির, আরদূবিয়াঁ, আখতাম। (ইবনু কাসীর)

জ্বিনদের খাবার

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর এক রিওয়ায়াতের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিনদেরকে হাড় ও জন্তুর মল বা গোবর (খাওয়ার জন্য) দিলেন। তারপর তিনি মুসলমানদের এ দুটি জিনিস দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করলেন। (ইবনু জারীর)

আ'মাশ (রাহঃ) বলেন ঃ "একটি জ্বিন আমাদের কাছে আসতো। আমি একদা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে বললো ঃ "চাউল।" আমি তাকে চাউল এনে দিলাম। তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ঃ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিলো ঃ "হ্যাঁ, রয়েছে।" আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলাম ঃ রাফিযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বললো ঃ "তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়। (ইবনু কাসীর)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় বলেছেন ঃ "আজ রাত্রে পনেরজন জ্বিন, যারা পরস্পর চাচাতো ও ফুপাতো ভাই, কুরআন শুনার জন্য আমার নিকট আসবে।" তাতে হাড় ও গোবরের সাথে কয়লার কথাও রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ "সকাল হলে আমি ঐ জায়গায় গিয়ে দেখি যে, ওটা ষাটটি উটের বসার সমান জায়গা।" (ইবনু কাসীর)

মানুষদের কুপ্রথা ও জ্বিনেরা যেভাবে ক্ষতি সাধন করে

মুসনাদে ইবনু আবী হাতিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জ্বিনদের খুব বেশী বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখতো, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেতো তখনই সে বলতো ঃ আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে মনে করতো, সে সমস্ত জ্বিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন তারা যখন কোন শহরে যেতো তখন ঐ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হতো। ফলে ঐ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতো না, যদিও তারা তার শত্রু হতো। যখন জ্বিনেরা দেখলো যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের সাহস আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা আরো বেশী বেশী মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠলো ও তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করতো, এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে মানব যেতো সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেতো। কিন্তু যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করলো এবং বলতে লাগলো ঃ "এই উপত্যকার জ্বিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবে না;" তখন থেকে জ্বিনদের সাহস বেড়ে গেল। কারণ তারা মনে করলো, মানুষই তো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগলো। (ইবনু কাসীর)

কারদাম ইবনু আবী সায়িব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত;

তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে কোন কাজের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে বাইরের দিকে যাত্রা শুরু করি। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় রাসূলরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। রাত্রিকালে আমরা জঙ্গলে এক রাখালের নিকট অবস্থান করি। অর্ধেক রাতে একটি নেকড়ে বাঘ এসে ঐ রাখালের একটি বকরী ধরে নিয়ে যায়। রাখালটি বাঘটির পিছনে দৌড় দেয় এবং চিৎকার করে বলতে লাগে ঃ "হে এই উপত্যকার আবাদকারী! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি।" সাথে সাথে একটি শব্দ শোনা গেল, অথচ আমরা কোন লোককে দেখতে পেলাম না। শব্দটি হলো ঃ "হে নেকড়ে বাঘ! এ বকরীকে ছেড়ে দাও।" অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, ঐ বকরীটি পালিয়ে আসলো এবং এসে মিলিত হয়ে গেল। সে একটু যখমও হয়নি। এটার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ করেন ঃ কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ করতো, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিতো। (ইবনু আবী হাতিম)

হতে পারে যে, নেকড়ে বাঘের রূপ ধরে জ্বিনই এসেছিল, যে বকরীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং এদিকে ঐ রাখালটির দোহাইতে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে রাখালের এবং তার মুখে শুনে অন্যান্য লোকদেরও এ বিশ্বাস জন্মে যে, জ্বিনদের আশ্রয়ে আসলে বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। এভাবে জ্বিন মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দ্বীন হতে সরিয়ে দিতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

জ্বিনদের মিথ্যাচার ও তাদের শাস্তি

সাঈদ ইবনু জুবায়ির (রহঃ) হতে বর্ণিত; ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ জ্বিনেরা ওয়াহী শুনতে থাকতো। একটা কথা যখন তাদের কানে যেতো তখন তারা ওর সাথে আরো দশটি কথা মিলিয়ে দিতো। সুতরাং একটি সত্য হতো এবং বাকী সবই মিথ্যা হয়ে যেতো। ইতিপূর্বে তাদের উপর তারকা নিক্ষেপ করা হতো না। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন তখন তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। তারা তদের বসার জায়গায় যখন পৌছতো তখন তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতো। ফলে তারা সেখানে আর থাকতে পারতো না। তারা তখন এসে ইবলীসের নিকট এর অভিযোগ করলো। ইবলীস তখন বললো, অবশ্যই নতুন ব্যাপার কিছু ঘটছে। তাই সে তার সেনাবাহিনীকে এই তথ্য উদঘাটনের জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলো। একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নাখ্‌লার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামায রত অবস্থায় পেলো। অতঃপর তারা গিয়ে ইবলীসকে এ খবর দিয়ে দিলো। ইবলীস তখন বললো ঃ "এ কারণেই আকাশ রক্ষিত হয়েছে এবং তোমাদের তথায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

(আহমাদ, তিবরানী, নাসায়ী)

জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ

সূরা জ্বিনের আট ও পরবর্তী আয়াত থেকে প্রমাণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাবূওয়াত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাবূওয়াত লাভের সময় তাঁর ওয়াহীর হিফাযাতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জ্বিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জ্বিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হলো এবং আলো বিচ্ছুরিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?" আমরা উত্তরে বললাম ঃ আমরা বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ "না, তা নয়। বরং যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফয়সালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)।"

(ইবনু কাসীর)

ইবনু কাসীর থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ প্রকৃতপক্ষে তারকা খুববেশী নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হলো ওগুলো দ্বারা শয়তানদের ধ্বংস করা ও আকাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেন তারা আকাশের খবর নেয়া হতে বঞ্চিত হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জ্বিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলো যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং, তাদের একটি দল আরবে আসলো এবং সেখানে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফজরের নামাযে কুরআনে কারীম পাঠরত অবস্থায় পেলো। তারা তখন বুঝতে পারলো, এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বি'সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান জ্বিনগুলো মুসলমান হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জ্বিনদের ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ হলো না।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানরা ইতিপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলোচনা শুনতো। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাতে শয়তানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হলো, যা দেখে তায়িফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়লো যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। তারা লক্ষ্য করলো, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলো ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়িফবাসী তাদের গোলামগুলো আযাদ করতে এবং পশু আল্লাহর পথে ছেড়ে

দিতে শুরু করলো। পরিশেষে আবদি ইয়ালীল ইবনু আমর ইবনু উমায়ির তাদেরকে বললো ঃ "হে তায়িফবাসী! তোমাদের মালগুলো তোমরা ধ্বংস করছো কেন? তোমরা নক্ষত্রগুলোকে গণে পড়ে দেখো। যদি তারকাগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তবে জানবে যে আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইবনু আবী কাবশা অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।" তারা তখন নক্ষত্রগুলো গণে পড়ে দেখলো এবং দেখতে পেলো, তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিতস্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়িফবাসীরাও আশ্বস্থ হলো এবং শয়তানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি শুনালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বললো ঃ তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট মাটি নিয়ে এসো।" তারা তার নিকট মাটি নিয়ে আসলো। সে মাটি শুঁকালো এবং বললো ঃ "এর হেতু মক্কায় রয়েছে।" নাসীবাইনের সাতজন জ্বিন মক্কায় পৌছলো। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে হারামে নামায পড়াচ্ছিলেন এবং কুরআনে কারীম পাঠ করছিলেন। কুরআন শুনে ঐ জ্বিনদের অন্তর কোমল হয়ে গেল। আরো নিকটে গিয়ে তারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শুনতে থাকে এবং এতে মুগ্ধ হয়ে তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজেদের ক্বাওমকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়।

(ইবনু কাসীর)

যুবায়ির (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় ইশার নামায আদায় করছিলেন। এসব জ্বিন তাঁর আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; ওগুলো নাসীবাইনের জ্বিন ছিল। তারা সংখ্যায় সাতজন ছিল।

(মুসনাদ আহমাদ)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিনদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেও কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি। তিনি তো স্বীয় সাহাবীদের সাথে উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এদিকে ব্যাপার এই ঘটেছিল যে, শয়তানদেরও আকাশের খবরের মাঝে বাধা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়া শুরু হয়েছিল। শয়তানরা এসে তাদের ক্বাওমকে এ খবর দিলে তারা বলে ঃ "অবশ্যই নতুন কিছু একটি ঘটেছে। সুতরাং তোমরা অনুসন্ধান করে দেখো।" একথা শুনে তারা বেরিয়ে পড়লো। তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়েগেল। যে দলটি আরব অভিমুখে গেল, তারা যখন তথায় পৌছলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাযের দিকে যাওয়ার পথে নাখলায় স্বীয় সাহাবী (রাঃ)-দের ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। ঐ জ্বিনদের কানে যখন তাঁর তিলাওয়াতের শব্দ পৌছলো তখন তারা তথায় থেমে গেল এবং কান লাগিয়ে মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনতে লাগলো। এরপরে তারা পরস্পর বলাবলি করলো– এটাই ঐ জিনিস, যার কারণে আমাদের আকাশ

পর্যন্ত পৌছার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।" ফলে সেখানে হতে ফিরে তারা সরাসরি তাদের ক্বাওমের নিকট পৌছে যায় এবং তাদেরকে বলে ঃ "আমরা তো এক বিস্ময়কর কিতাব শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনোই আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শারীক করবো না।" এই ঘটনারই সংবাদ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সূরায়ে জ্বিনে দিয়েছেন।" (বুখারী, মুসলিম)

ঐ সময় যে জ্বিনগুলো এসেছিল তাদের উপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানা ছিল না। তারা তো তাঁর অজান্তে তাঁর মুখে আল্লাহর বাণী শুনে ফিরে গিয়েছিল। এরপরে প্রতিনিধি হিসেবে জ্বিনেরা দলে দলে তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হয়েছিল। (ইবনু কাসীর)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমেবাধা দেয়া হয়েছিল। এ সময়ে জ্বিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ও আনাচে-কানাচে জ্বিনদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হিজাযে প্রেরিত

তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখাল' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

জ্বিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে কসম করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছেন।

জ্বিনেরা কুরআন কারীম শ্রবণ করেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। সুতরাং, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তুমি তাদেরকে বল ঃ আমার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের ক্বাওমের মধ্যে দিয়ে বলে– আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করবো। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۞

অর্থাৎ "যখন আমি জ্বিনদের একটি দলকে তোমার নিকট পাঠিয়ে ছিলাম, যেন তারা কুরআন শ্রবণ করে।" (সূরা ঃ আহকাফ ২৯)

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ জ্বিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলে ঃ আমাদের প্রতিপালকের কার্য

ক্ষমতা ও নির্দেশ উচ্চ মানের এবং বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর নিয়ামাতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের। তাঁর মহত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। তাঁর যিকির উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের।

ঐ জ্বিনেরা আরো বলতে থাকে, আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারে না। কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম, এ দু'টি জাতি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

জ্বিনদের কুরআন শ্রবণ ও নামায আদায় করা

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত ঃ আলকামা (রহঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "জ্বিনদের আগমনের রাত্রিতে আপনাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর সাথে কেউই ছিলেন না। তিনি সারা রাত আমাদের হতে অনুপস্থিত থাকেন এবং আমরা থেকে থেকে বারবার এই ধারণাই করি যে, সম্ভবতঃ কোন শত্রু তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে। ঐ রাত্রি আমাদের খুব খারাপভাবে কাটে। সুবহি সাদিকের কিছু পূর্বে আমরা দেখি, তিনি হেরা পর্বতের গুহা হতে ফিরে আসছেন। আমরা তখন তাঁর কাছে আমাদের

সারা রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ "আমার কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধি এসেছিল, যাদের সঙ্গে গিয়ে আমি তাদেরকে কুরআন শুনিয়েছি।" অতঃপর তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে যান এবং তাদের নিদর্শনাবলী ও তাদের আগুনের নিদর্শনাবলী আমাদেরকে প্রদর্শন করেন।"

(ইবনু কাসীর)

ইবনু মাসউদের (রাঃ) একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ "ঐ রাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি এবং তাঁকে আমরা সমস্ত উপত্যকা ও ঘাঁটিতে অনুসন্ধান করি।" অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আজ রাত্রে আমি, জ্বিনদেরকে কুরআন শুনিয়েছি এবং তাদেরই মধ্যে এ কাজে রাত্রি কাটিয়েছি।"

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আজ রাত্রে তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে জ্বিনদের কাজে আমার সাথে থাকতে পার।" তখন আমি ছাড়া আর কেউই এ কাজে তাঁর কাছে হাযির হলো না। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। মক্কা শরীফের উঁচু অংশে পৌছে তিনি নিজ পা মুবারাক দ্বারা একটি রেখা টানলেন এবং আমাকে বললেন ঃ "তুমি এখানেই বসে থাকো।" অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কিরআত পাঠ শুরু করেন। তারপর তাঁর চতুর্দিকে এমন সব দল জমায়েত হয় যে, তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁর কিরআত আর আমার কানে আসেনি। এরপর আমি

দেখি, মেঘখণ্ড যেভাবে ভেঙ্গে যায় সেইভাবে তারা এদিক ওদিক যেতে লাগলো এবং খুব অল্প সংখ্যকই অবশিষ্ট থাকলো। তারপর ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর লাভ করলেন এবং সেখান হতে দূরে চলে গেলেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে তিনি আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বাকীগুলো কোথায়?" আমি জবাবে বললাম ঃ এই যে তারা। অতঃপর তিনি তাদেরকে হাড় ও জন্তুর মল বা গোবর (খাওয়ার জন্য) দিলেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে এ দু'টি জিনিস দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করলেন।

(ইবনু জারীর)

সাওয়াদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে জ্বিনের ভূমিকা

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণি হয় ঃ উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বারে উঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই তিনি জনগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "সাওয়াদ ইবনু কারিব এখানে আছে কি?" কিন্তু ঐ পূর্ণ এক বছরের মধ্যে কেউ 'হ্যাঁ' বললো না। পরের বছর আবার তিনি এটা জিজ্ঞেস করলেন। তখন বারা' (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ "সাওয়াদ ইবনু কারিব কে? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?" জবাবে উমার (রাঃ) বললেন ঃ "তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর।" এভাবে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলছিল এমতাবস্থায় সাওয়াদ ইবনু কারিব (রাঃ) সেখানে হঠাৎ করেই হাযির হয়ে যান। উমার (রাঃ) তখন তাঁকে বলেন ঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! তোমার

ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ঘাটনাটি বর্ণনা কর।" তিনি তখন বললেন ঃ "হ্যাঁ, তাহলে শুনুন। আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম এবং সেখানেয় অবস্থান করছিলাম। একদা রাত্রে আমার সাথী জ্বিনটি আমার কাছে আসে। ঐ সময় আমি ঘুমিয়েছিলাম। সে আমাকে জাগ্রত করে এবং বলে ঃ "উঠো এবং জ্ঞান-বিবেক থাকলে শুনে ও বুঝে নাও যে, লুওয়াই ইবনু গালিব গোত্রের মধ্য হতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন।" অতঃপর সে কবিতায় বললো ঃ

অর্থাৎ "আমি জ্বিনদের অনুভূতি এবং তাদের বস্তা ও বিছানা-পত্র বাঁধা দেখে বিস্ময়বোধ করছি। তুমি যদি হিদায়াত লাভ করতে চাও তবে এখনই মক্কার পথে যাত্রা শুরু কর। তুমি বুঝে নাও যে, ভাল মন্দ জ্বিন সমান নয়। অতি সত্বর গমন কর এবং বানু হাশিমের প্রিয় ব্যক্তির সুন্দর চেহারা দর্শনের মাধ্যমে স্বীয় চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা কর।"

আমাকে পুনরায় তন্দ্রায় চেপে ধরে এবং সে আবার আমাকে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর বলে ঃ "হে সাওয়াদ ইবনু কারিব (রাঃ)! আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তুমি তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট গিয়ে হিদায়াত লাভে ধন্য হও।" দ্বিতীয় রাত্রে আবার সে আমার নিকট আসে এবং আমাকে জাগিয়ে দিয়ে কবিতার মাধ্যমে বলে ঃ

অর্থাৎ "আমি জ্বিনদের অনুসন্ধান এবং তাদের বস্তা ও থলে কষা দেখে বিস্মিত হচ্ছি, তুমিও যদি সুপথ পেতে চাও তবে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও। জেনে রেখো, ওদের দুই পা ওদের লেজের মত নয়। তুমি তাড়াতাড়ি উঠো এবং

বানু হাশিমের ঐ পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট পৌছে যাও এবং তাঁকে দর্শন করে স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে জ্যোতির্ময় কর।"

তৃতীয় রাত্রে সে আবার আসলো এবং আমাকে জাগ্রত করে কবিতার ভাষায় বললো ঃ

অর্থাৎ "আমি জ্বিনদের খবর জেনে নেয়া এবং তাদের যাত্রীদের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। তারা সব হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। তাদের মন্দরা ভালোদের মত নয়। তুমিও উঠো এবং বানু হাশিমের এই মহান ব্যক্তির খিদমাতে হাযির হয়ে যাও। জেনে রেখো, মু'মিন জ্বিনেরা কাফির জ্বিনদের মত নয়।"

পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি ধরে তার এসব কথা শুনে আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রেম জেগে ওঠে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান ও ভালবাসায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আমি আমার উটের পিঠে হাওদা কষে অন্য কোন জায়গায় অবস্থান না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে হাযির হলাম। ঐ সময় তিনি মাক্কা শহরে ছিলেন এবং জনগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে বসেছিলেন- যেমন ঘোড়ার উপর কেশর থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখেই বলে উঠলেন ঃ "হে সাওয়াদ ইবনু কারিব (রাঃ)! তোমার আগমন শুভ হোক! তুমি আমার কাছে কি করে, কি উদ্দেশ্যে এবং কার কথায় এসেছো তা আমি জানি।" আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম! আমি কিছু কবিতা বলতে চাই, অনুমতি দিলে বলি। তিনি বললেন ঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! ঠিক আছে, তুমি বল।" তখন আমি বলতে শুরু করলাম ঃ

অর্থাৎ "আমার নিকট আমার জ্বিন রাত্রে আমার ঘুমিয়ে পড়ার পর আসলো এবং আমাকে একটি সঠিক ও সত্য খবর দিলো। পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি সে আমার কাছে আসতে থাকলো এবং প্রতি রাত্রে আমাকে বলতে থাকলো ঃ লুওয়াই ইবনু গালিবের মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। আমিও তখন সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম এবং তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে এখানে পৌছলাম। এখন আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল। আপনার শাফাআতের উপর আমার আস্থা রয়েছে। হে সর্বাপেক্ষা মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে সমস্ত রাসূলের চেয়ে উত্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যে আসমানী হুকুম আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন তা যতই কঠিন ও স্বভাব বিরুদ্ধ হোক না কেন, এটা সম্ভব নয় যে, আমরা তা পরিহার করি। আপনি অবশ্যই কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশকারী হবেন। কেননা, সেই দিন সেখানে আপনি ছাড়া সাওয়াদ ইবনু কারিব (রাঃ)-এর সুপারিশকারী আর কে হবে?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব হাসলেন এবং বললেন ঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছো।" উমার (রাঃ) এ ঘটনাটি শুনে সাওয়াদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখনো কি ঐ জ্বিন তোমার কাছে এসে থাকে?"

উত্তরে তিনি বললেন ঃ "যখন হতে আমি কুরআন পাঠ করতে শুরু করি তখন হতে আর সে আমার কাছে আসে না। আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে জ্বিনের পরিবর্তে তাঁর পবিত্র কিতাব দান করেছেন।" (ইবনু কাসীর)

জ্বিনদের জান্নাত লাভ

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ মু'মিন জ্বিন মু'মিন মানুষের মতই এবং তারা জান্নাত লাভ করবে। জ্বিনেরা যে জান্নাত পাবে এর উপর কতকগুলো লোক নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۞

অর্থাৎ "তাদেরকে (হূরদেরকে) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।"

(সূরাঃ আর্-রহমান-৫৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান (দু'টি জান্নাত)। সুতরাং তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা ঃ রহমান- ৪৬-৪৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছেন যে, তাদের মধ্যে যারা

পুণ্যবান তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত। আর মু'মিন মানুষ অপেক্ষা মু'মিন জ্বিনেরাই এই আয়াতের বেশী শুকরিয়া আদায় করেছিল এবং এটা শুনামাত্রই বলেছিল ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এমন কোন নিয়ামাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।" এটা তো হতে পারে না যে, তাদের সামনে তাদের উপর এমন অনুগ্রহ করার কথা প্রকাশ করা হবে যা তারা লাভ করতেই পারবে না। মু'মিন জ্বিনেরা যে জান্নাতে যাবে তার আরো একটি দলীল এই যে, কাফির জ্বিন যখন জাহান্নামে যাবে যা ন্যায়ের স্থল, তখন মু'মিন জ্বিন কেন জান্নাতে যাবে না যা অনুগ্রহের স্থল? বরং তা আরো বেশী সঙ্গত। তাছাড়া এর উপর ঐ আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যেগুলোতে সাধারণভাবে মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান।" (সূরা ঃ কাহফ-১০৭)

জান্নাতের তো অবস্থা এই যে, সমস্ত মু'মিন তাতে প্রবেশ করার পরেও ওর মধ্যে সীমাহীন জায়গা শূন্য থাকবে। তাহলে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জ্বিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর কি কারণ থাকতে পারে? এখানে দু'টি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ (১) পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া এবং (২) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ দান করা। এ দু'টো থাকলেই তো জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। কেননা, পরকালে

নির্ধারিত রয়েছে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। সুতরাং যাকে জাহান্নাম হতে বাঁচিয়ে নেয়া হবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়া উচিত। আর এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, মু'মিন জ্বিন জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করা সত্ত্বেও জান্নাতে যাবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

(ইবনু কাসীর)

জ্বিনদের ব্যাপারে কতকগুলো গারীব বা দুর্বল উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ জ্বিনেরা জান্নাতে তো প্রবেশ করবে না, তবে তারা জান্নাতের ধারে ধারে এবং এদিকে ওদিকে থাকবে।

কতক লোক বলেন ঃ তারা জান্নাতে যাবে বটে, কিন্তু তথায় দুনিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। অর্থাৎ মানুষ জ্বিনকে দেখতে পাবে, কিন্তু জ্বিন মানুষকে দেখতে পাবে না।

কেউ কেউ বলেন ঃ তারা জান্নাতে পানাহার করবে না; শুধু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর মহিমা কীর্তনই হবে তাদের খাদ্য; যেমন ফেরেশতাগণ। কেননা, তারা ফেরেশতাদেরই শ্রেণীভূক্ত। কিন্তু এসব উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে এবং এগুলো সবই দলীলবিহীন উক্তি।

ইবলীসের পরিচয়

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত; ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) থেকে, ইবলীস সৃষ্ট হয় অগ্নিশিখা হতে, আর আদম (আঃ)-কে যা থেকে সৃষ্টি করা হয় তার বর্ণনা তোমাদের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের উপর এসে থাকে। ইবলীস যদিও ফেরেশতাদের মতই আমাল করছিল এবং তাঁদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল আর আল্লাহর ইবাদাতের কাজে দিন-রাত নিমগ্ন ছিল, কিন্তু আল্লাহর ঐ নির্দেশ শোনা মাত্রই তার আসল রূপ ফুটে উঠলো। সুতরাং সে অহঙ্কার করলো এবং পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে বসলো। তার সৃষ্টিই তো ছিল আগুন থেকে। যেমন সে নিজেই বলেছে ঃ "আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" ইবলীস কখনই ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে হচ্ছে জ্বিনদের মূল, যেমন আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল।

এটাও বর্ণিত আছে যে, এই জ্বিনেরাও ছিল ফেরেশতাদের একটি শ্রেণী, যাদেরকে তেজ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইবলীসের নাম ছিল হারত। সে ছিল জান্নাতের দারোগা। এই দলটি ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারা ছিলেন নূরী (জ্যোতির্ময়)। জ্বিনেরা অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্ট ছিল। (ইবনু কাসীর)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইবলীস সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে ছিল সম্ভ্রান্ত গোত্রভুক্ত।

জান্নাতসমূহের সে দারোগা ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের বাদশাহ। যমীনেরও সম্রাট সে-ই ছিল। এ কারণেই তার মনে অহঙ্কার এসে গিয়েছিল যে, সে সমস্ত আকাশবাসী হতে শ্রেষ্ঠ। তার সেই অহঙ্কার বেড়েই চলছিল। এর সঠিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলাই জানতেন। সুতরাং এটা প্রকাশকরণার্থেই তিনি আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। সাথে সাথেই তার অহঙ্কার প্রকাশ পেয়ে যায়। অহঙ্কার বশতঃই সে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে এবং কাফির হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সে জ্বিন ছিল এবং জান্নাতের দারোগা ছিল; যেমন লোকদেরকে শহরের দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে বলা হয়-মাক্কী, মাদানী, বসরী, কূফী ইত্যাদি। সে জান্নাতের খাজাঞ্চি ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের কামান বাহক। এখানকার ফেরেশতাদের সে ছিল নেতা। এই অবাধ্যাচরণের পূর্বে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু থাকতো সে যমীনে। এ কারণেই সে গর্বে ফুলে উঠেছিল। তার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন। আসমান ও যমীনের মাঝে সে চলাফেরা করতো। প্রতিপালকের নাফরমানীর কারণে সে তাঁর রোষাণালে পতিত হয়। ফলে সে বিতাড়িত শয়তান থেকে যায় এবং অভিশপ্ত হয়। সুতরাং অহঙ্কারীর তাওবার কোন আশা নেই। তবে, যদি সে অহঙ্কারী না হয় এবং তার দ্বারা কোন পাপকার্য হয়ে যায় তা হলে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

(ইবনু কাসীর)

শয়তান যেভাবে পথভ্রষ্ট করে

সূরা হাশরের ১৬ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় ঃ শয়তান– যে মানুষকে বলে ঃ কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলে ঃ "তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহুদীদের কাজে না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাচ্ছেন ঃ দেখো, শয়তান এই ভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলে ঃ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।

তাফসীর ইবনু জারীর থেকে প্রমাণিত ঃ বানী ইসরাঈলের একজন আবিদের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনু নাহীক (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন আবিদ ছিলেন। তিনি ষাট বছর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে একজন মহিলার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। সে তার উপর এমনভাবে

প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে যেন জ্বিনে ধরেছে এবং লক্ষণ প্রকাশ পায়। এদিকে ঐ মহিলাটির ভাইদেরকে সে এই কু-মন্ত্রণা দেয় যে, ঐ আবিদের কাছেই এর চিকিৎসা হতে পারে। তারা মহিলাটিকে ঐ আবিদের কাছে নিয়ে গেল এবং লোকটি তখন তার চিকিৎসা অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক, দু'আ-তাবীয ইত্যাদি দেওয়া শুরু করে দিলেন। মহিলাটি তাঁর ওখানেই থাকতে লাগলো। একদিন আবিদ মহিলাটির পার্শ্বেই ছিলেন এমন সময় শয়তান তাঁর মনে কু-চিন্তার উদ্রেক করলো। শেষ পর্যন্ত তিনি মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে বসলেন। মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে গেল। এখন এই লজ্জা নিবারণের পন্থা ঐ শয়তানই বাতলিয়ে দিল যে, তিনি যেন মহিলাটিকে মেরে ফেলেন, অন্যথায় রহস্য খুলে যাবে। সুতরাং ঐ আবিদ মহিলাটিকে হত্যা করে ফেললেন। ওদিকে শয়তান মহিলাটির ভাইদের মনে আবিদের উপর সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। তারা আবিদের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলো। এদিকে শয়তান আবিদের কাছে এসে বললো ঃ "মহিলাটির লোকেরা আপনার কাছে আসছে। এখন আপনার মান-সম্মানও যাবে এবং প্রাণও যাবে। সুতরাং এখন যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করেন এবং আমি যা বলি তা মেনে নেন তবে আপনার মান-সম্মান ও প্রাণ বেঁচে যেতে পারে।" আবিদ বললেন ঃ "ঠিক আছে, তুমি যা বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।" শয়তান তখন বললো– "আমাকে সিজদাহ্ করুন!" তিনি সিজদাহ করলেন। শয়তান তখন বললো ঃ হে হতভাগ্য! ধিক্ আপনাকে। আপনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (ইবনু জারীর)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বকরী চড়াতো এবং একজন পাদরীর আশ্রমের নীচে রাত্রি যাপন করতো। তার চারটি ভাই ছিল। একদিন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পাদরী ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচার করে বসলেন। স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী হয়ে গেল। শয়তান পাদরীর কাছে এসে বললো ঃ "এটা তো বড়ই লজ্জার কথা। সুতরাং উত্তম পন্থা এটাই যে, মহিলাটিকে হত্যা করে কোন জায়গায় পুঁতে ফেলুন। আপনার সম্পর্কে মানুষের মনে কোন ধারণাই আসবে না। কেননা, আপনার পবিত্রতা সম্বন্ধে তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর যদি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয় তবে মিথ্যা কিছু একটা বলে দিবেন। কে এমন আছে যে, আপনার কথা বিশ্বাস করবে না?" এক রাত্রে সুযোগ পেয়ে শয়তানের কথামত তিনি মহিলাটিকে হত্যা করে দিলেন এবং এক জন-মানবহীন জঙ্গলে পুঁতে ফেললেন। তখন শয়তান মহিলাটির চার ভাই এর নিকট গমন করলো এবং স্বপ্নে প্রত্যেককে ঘটনাটি শুনিয়ে দিলো। তাকে পুঁতে ফেলার জায়গাটির কথাও বলে দিলো। সকালে জেগে ওঠে তাদের একজন বললো ঃ "আজ রাত্রে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমার সাহস হয় না যে, আপনাদের সামনে এটা বর্ণনা করি!" তার ভাইয়েরা বললো ঃ " না, অবশ্যই তোমাকে বলতে হবে।" তখন সে বলতে শুরু করলো যে, এইভাবে অমুক আবিদ তাদের বোনের সাথে কু-কাজ করেছিল। ফলে সে গর্ভবতী হয়েছিল, তাই সে তাকে হত্যা করেছে এবং অমুক জায়গায় তার মৃতদেহ পুঁতে রেখেছে। তার এ স্বপ্নের কথা শুনে ঐ তিন ভাইয়ের প্রত্যেকে

বললো ঃ "আমিও এই স্বপ্নই দেখেছি।" এখন সবারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এ স্বপ্ন সত্য। সুতরাং তারা এ খবর সরকারকে দিয়ে দিল। বাদশাহর হুকুমে আবিদকে পাকড়াও করা হলো এবং যে জায়গায় সে মহিলাটির মৃতদেহ পুঁতে রেখেছিল সেখানে যাওয়া হলো। তারপর ঐ জায়গা খনন করিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। পূর্ণ প্রমাণের পর ঐ পাদরীকে শাহী দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ সময় শয়তান তার সামনে প্রকাশিত হয়ে বললো ঃ "এসব আমিই করিয়েছি। এখনও যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করতে পারি।" আবিদ বললো ঃ "বল, কি বলবে? উত্তরে শয়তান বললো ঃ "আমাকে সিজদাহ্ করুন।" আবিদ তাকে সিজদাহ্ও করলো। এভাবে তাকে পূর্ণ বে-ঈমান বানিয়ে নিয়ে শয়তান তাকে বললো ঃ আপনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।" অতঃপর বাদশাহ্র নির্দেশক্রমে পাদরীকে হত্যা করে দেয়া হলো।

এটা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, ঐ পাদরীর নাম ছিল বারসীমা। আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ), তাউস (রাঃ), মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এ ঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে কিছু কম-বেশীর সাথে বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। (ইবনু কাসীর)

ইবলীসের অহংকারের পরিণাম

ইবলীস বলেছিল– "আমি আদম (আঃ)-এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কাউকে সিজদা করতে পারে না যার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদম (আঃ)-কে সিজদা করার হুকুম হল কেন?" সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্তু ঐ সম্মানিত আদম (আঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যাঁকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ ভরে দিয়েছেন। সে একটা বিকৃত অনুমান কায়িম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরোধী। মোটকথা, সমস্ত ফেরেশতা সিজদায় পড়ে গেলেন। ইবলীস সিজদা না করার কারণে ফেরেশতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল। তার দাবী ছিল এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মিবার স্থান। আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া। ইবলীসের উপাদান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদম (আঃ)-এর উপাদান রুজূ, অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর উপকার সাধন করেছিল। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা এবং হূরদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাফরান দ্বারা।" ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়িমকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়।

ইবলীসের দু'টি কথা

ইবলীস আদম (আঃ)-কে সিজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আদম মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্ন আল্লাহর আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলা বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে মালিককে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন সে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামাত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন ঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ- জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে।

ইবলীস মু'মিনদের পথ ভ্রষ্ট করতে পারবে না

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ আল্লাহ বললেন- "তুমি আমার আদেশ অমান্য করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার অহংকার করার কোন অধিকার ছিল না।"

মহান আল্লাহ বলেন- "তুমি বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। এটা ছিল ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল।" এখানে ইবলীস একটা কথা চিন্তা করল এবং কিয়ামাতের দিবস পর্যন্ত অবকাশ চাইল। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বললেন- "যাও তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল।" এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছাই কাজ করছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারে না। তাঁর হুকুমের পর আর কারো হুকুম চলতে পারে না। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

যখন ইবলীস কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিল। সে বলল– "হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেব।"

সে বলল– "আমি আদম (আঃ)-এর প্রতিশোধ তাঁর বংশধর হতে গ্রহণ করব। কেননা, তাঁরই কারণে আমি আপনার দরবার হতে বহিষ্কৃত হয়েছি।"

ইবলীস বলল ঃ "আমি আপনার বান্দাদেরকে এইভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করব যে, তারা আপনার ইবাদাত করবে না এবং আপনার একত্ববাদ থেকে দূরে থাকবে।"

সে বলল ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একত্ববাদীরূপে পাবেন না।" এ কথাটা শয়তান নিজ খেয়াল ও ধারণার ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "ইবলীসের এ ধারণা ঠিকই ছিল। কেননা, মু'মিনরা ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করছে। কিন্তু মু'মিনদের উপর সে তার জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আর আমি যে শয়তানকে এই চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা দিয়েছি তার উদ্দেশ্য এই যে, কে পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং কে সন্দেহ পোষণকারী তা যেন প্রকাশ পেয়ে যায়।"

(ইবনু কাসীর)

শয়তান যেভাবে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে প্রতারণা করল

সূরা আরাফের ১৯ ও পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় ঃ আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-এর জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার।

এ ব্যাপার দেখে শয়তানের তাঁদের দু'জনের উপর হিংসা হল। সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগল, যে নিয়ামাত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তাঁরা লাভ করেছেন তা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। এখন ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে বলল ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা এই রয়েছে যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খেয়ে নাও তবে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে।" যেমন সে বলেছিল ঃ "হে আদম (আঃ)! আমি কি তোমাকে এমন গাছের কথা ও এমন ভূ-সম্পত্তির কথা বলে দেব যা কখনো ধ্বংস হবে না?"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আদম (আঃ)-কে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছিল গমের শীষ। যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাঁদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখন তাঁরা গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির

সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্বোধন করে বলেন ঃ "হে আদম (আঃ)! আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করেছিলাম এবং সেখানকার সব জিনিসই তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলাম। একমাত্র একটি গাছ তোমাদের জন্য অবৈধ করেছিলাম এবং ওর ফল খেতে নিষেধ করেছিলাম, এটা কি সত্য নয়?" আদম (আঃ) উত্তরে বলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ এটা সত্য বটে, তবে আপনার মর্যাদার শপথ! আমার এটা ধারণাও ছিল না যে, আপনার নামে কসম খেয়ে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে!" যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۞

অর্থাৎ- "আমি কসম খেয়ে বলছি যে আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী।"

(সূরা ঃ আল আরাফ ঃ ২১)

আদম (আঃ) ও ইবলীসের আবেদন

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) জান্নাতের ডুমুরের পাতাকে পোশাকের আকারে দেহে জড়িয়েছিলেন। ওয়াহ্হাব ইবনু মুনাব্বাহ্ বলেন ঃ আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর নূরানী পোশাক ছিল, ফলে একে অপরের উলঙ্গরূপ দেখতে পেতেন না। যখন তাঁদের উলঙ্গরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল তখন তা আবৃত করার খেয়াল তাঁদের অন্তরে প্রকৃতিগতভাবে জেগে উঠল। কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) বলেছিলেন- "হে আমার প্রতিপালক! আমার তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হ্যাঁ, আছে। ঐ

অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে প্রবিষ্ট করব।" কিন্তু ইবলীস তাওবার অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করলেন।

আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলো শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ- "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে- "হায়, আফসোস! ইবনু আদমকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সে সিজদা করেছে, ফলে সে জান্নাতী হয়েছে। পক্ষান্তরে আমি এতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।" (মুসলিম)

ইবলীসের কুমন্ত্রণায় আদম ও হাওয়া (আঃ)

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আদম (আঃ) খেজুর গাছের মতো দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা। যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাঁর দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গের প্রতি

লক্ষ্য করতেন না। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক ফিরতে লাগলেন। জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠল ঃ "আমি আপনাকে ছাড়ব না।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ "তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?" আদম (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ "হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে লজ্জাবোধ করছি। কেননা, আমার দেহাবরণ খুলে গেছে।" (ইবনু কাসীর)

ইবনু কাসীর থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলেন ঃ "আমিও স্বীয় মর্যাদার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে যমীনে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে ও বিপদ আপদে পড়তে হবে এবং সেখানে তোমরা কোন শান্তি পাবে না।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা জান্নাত থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে যাও। জান্নাতে তোমরা সর্বপ্রকারের নিয়ামাত ভোগ করছিলে, কিন্তু এখন খাদ্য ও পানীয়ের কোন সুস্বাদু নিয়ামাত তোমরা পাবে না।" মহান আল্লাহ দুনিয়ায় আদম (আঃ)-কে লোহার উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করলেন এবং তাঁকে কৃষিকার্য শিক্ষা দিলেন। আদম (আঃ) কৃষিকার্য শুরু করে দিলেন। ক্ষেতে পানি সেচন করলেন। শস্য পেকে উঠলে তিনি তা কেটে নিলেন এবং ওটা মাড়াই করে দানা বের করলেন। তারপর তা খাওয়ার উপযোগী করলেন। এরপর রুটি তৈরীকরে তা ভক্ষণ করলেন। যে কষ্ট তাদের ভাগ্যে লিখা ছিল তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ীই লিখিত হয়েছিল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; যখন আদম (আঃ) গম খেয়ে নিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ "আমি তোমাকে এ গাছ থেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি এর ফল খেলে কেন?" তখন তিনি জবাবে বললেন ঃ "হাওয়া আমাকে এটা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।" আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন ঃ "আমি হাওয়াকে এ শাস্তি দিলাম যে, গর্ভবতী থাকা অবস্থায় সে ব্যাথা ও কষ্ট পাবে এবং প্রসবের সময়ও তাকে কষ্ট দেয়া হবে।" একথা শুনে হাওয়া (আঃ) কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বললেন ঃ "যখন তুমি সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি ও তোমার সন্তান উভয়েই কাঁদবে।" (ইবনু কাসীর)

শয়তানের প্ররচনায় আদম সন্তানের নাম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; হাওয়া (আঃ)-এর যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করত তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হত এবং তাদের নাম আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ইত্যাদি রাখা হত। এ সন্তানগুলো মারা যেত! একদা ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য নাম রাখ তবে তারা জীবিত থাকবে। অতঃপর হাওয়া (আঃ)-এর এক সন্তান ভূমিষ্ট হল। তখন পিতা-মাতা তার নাম রাখলেন আব্দুল হারিস। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم .... একথা বলেন। (ইবনু কাসীর)

তাফসীর ইবনু কাসী থেকে আরো প্রমাণিত হয় ঃ হাওয়া (আঃ)-এর মনে সন্দেহ ছিল গর্ভ ছিল কি ছিল না।

মোটকথা, যখন গর্ভ ভারী হয়ে উঠল তখন দু'জনই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন যে, যদি তিনি সহীহ সালিম ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তবে তাঁরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। তখন শয়তান তাঁদের উভয়ের কাছে এসে বলল ঃ তোমাদের কিরূপ সন্তান ভূমিষ্ট হবে তার কোন খবর তোমরা রাখো কি? সেই সন্তান মানুষের আকার বিশিষ্টও হতে পারে, আবার জন্তুর আকৃতি বিশিষ্টও হতে পারে। ভুল কথা তাঁদের সামনে সে শুভ রূপে পেশ করল। সে তো প্রতারকই বটে। ইতোপূর্বে তাঁদের দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেই মারা গিয়েছিল। শয়তান তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলল ঃ "তোমরা যদি আমার নামে সন্তানের নাম না রাখো তবে তোমাদের সন্তান বিকলাঙ্গ হবে এবং জীবিতও থাকবে না।" সুতরাং তার কথামত তাঁরা সন্তানের নাম আব্দুল হারিস রেখে দিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী সহীহ সালিম ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন তখন তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে বসল।" এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রথমবারের গর্ভের সময় সে (শয়তান) তাঁদের কাছে আগমন করে এবং তাঁদেরকে ভয় দেখিয়ে বলে– আমি তো সেই, যে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছিল। এখন যদি তোমরা আমার কথামত কাজ না কর তবে আমি এমনভাবে ভেল্কী লাগিয়ে দিব যে, এই সন্তানের শিং বেরিয়ে যাবে এবং সে পেট ফেড়ে বেরিয়ে পড়বে এবং এই হবে ঐ হবে। এইভাবে সে তাঁদেরকে আতংকগ্রস্ত করল। কিন্তু তাঁরা তার কথা মানলেন না। আল্লাহর সদিচ্ছায় মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হল। দ্বিতীয়বার হাওয়া (আঃ) গর্ভধারণ করলেন। সেবার মৃত

সন্তানই ভূমিষ্ট হল। এবার শয়তান নিজেকে অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তাদের সামনে পেশ করল। তখন সন্তানের ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করল এবং তারা সন্তানের নাম আব্দুল হারিস রেখে দিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ❋

এই ঘটনাটি আহলে কিতাব থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন তাফসীরে ইবনু আবূ হাতিমে রয়েছে। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা তাদের কথাকে সত্যও বলো না এবং মিথ্যাও বলো না।"

ইবলীসের প্রতিফল

তাফসীর ইবনু জারীরে বানু খাযারা গোত্রের একজন শাইখের বর্ণনা রয়েছে যে, দানব ও মানব যখন পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে, তখন ইবলীস বলবে ঃ "আমি যাচ্ছি এবং ব্যাপার কি তা জেনে আসছি। অতঃপর সে পূর্ব দিকে পালাবে। কিন্তু সেখানে ফেরেশতাদের দল দেখে সে থমকে দাঁড়াবে এবং ফিরে গিয়ে পশ্চিম দিকে যাবে। সেখানেও ঐ একই অবস্থা দেখে ডানে-বামে পালাবে। কিন্তু চতুর্দিকেই ফেরেশতাদের পরিবেষ্টন দেখে নিরাশ হয়ে গিয়ে চীৎকার শুরু করে দেবে। হঠাৎ একটা ছোট রাস্তা তার নজরে আসবে। তখন সে তার সমস্ত সন্তানদেরকে নিয়ে ঐ পথ ধরে চলতে থাকবে। কিন্তু সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখবে যে, দোযখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। জাহান্নামের একজন দারোগা তাকে বলবে– "ওরে কষ্টদায়ক কলুষিত শায়তান! আল্লাহ তা'আলা

কি তোর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন না? তুই কি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলি না?" সে উত্তরে বলবে ঃ "আজ শাসন-গর্জন করছো কেন? আজ পরিত্রাণের পথ বাতলিয়ে দাও। আমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। যদি আল্লাহর হুকুম হয় তবে আমি এমন ইবাদাত করবো যা ভূ-পৃষ্ঠে কেউ কখনো করেনি।" তার এ কথা শুনে দারোগা বলবেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোর জন্য একটা নির্দেশনামা নির্ধারণ করছেন।" সে তখন খুশী হয়ে বলবে ঃ "আমি তাঁর হুকুম পালনের জন্য সর্বপ্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।" তখন হুকুম দেয়া হবে ঃ "ঐ নির্দেশনামা এটাই যে, তোরা সবাই জাহান্নামে চলে যা। এই কলুষিত শায়তান তখন হতভম্ব হয়ে যাবে। সেখানে ফেরেশতা নিজের পালক দ্বারা তাকে ও তার সন্তানদেরকে ছেচড়াতে ছেচড়াতে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। জাহান্নাম তাদেরকে নিয়ে এমনভাবে তর্জন-গর্জন করতে থাকবে যে, সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, সমস্ত রাসূল হাঁটুর ভরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার সামনে পড়ে যাবেন। (ইবনু জারীর)

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবলীসের শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন ঃ "দেখো, এই শয়তান তোমাদের পিতা আদম (আঃ)-এর প্রকাশ্য শত্রু ছিল। তার সন্তানরা অনুরূপভাবে বরাবরই তোমাদের শত্রু। সিজদার নির্দেশ শুনে সমস্ত ফেরেশতা বিনাবাক্য ব্যয়ে আদম (আঃ)-এর সামনে মাথা

নত করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞানে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।" সে বলে ঃ "যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা, আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা।" অতঃপর সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলে– "আচ্ছা, আপনি যে আদম (আঃ)-কে আমার উপর মর্যাদা দান করলেন তাতে কি হলো? জেনে রাখুন যে, আমি তাঁর সন্তানদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বো। তাদের সকলকেই আমি আমার অনুগত বানিয়ে নিবো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। অল্প কিছুলোক আমার ফাঁদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করে ফেলবো।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-মালে ও সন্তান-সন্তুতিতেও শরীক থাক। অর্থাৎ তুই তাদেরকে তাদের মাল আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ করাতে থাক। যেমন, তারা সুদ খাবে, হারাম উপায়ে মাল জমা করবে এবং হারাম কাজে তা ব্যয় করবে। হালাল জন্তুগুলোকে তারা হারাম করে নেবে ইত্যাদি। আর সন্তান-সন্তুতিতে তার শরীক হওয়ার অর্থ হলো ঃ যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ পিতা-মাতারা তাদের সন্তানকে জীবন্তই মাটিতে পুঁতে ফেলা, তাদের ইয়াহূদী, খৃষ্টান, মাজূসী ইত্যাদি বানিয়ে দেয়া সন্তানদের নাম আব্দুল হারিস, আবদুশ-শামস, আব্দি ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা। মোটকথা, যে কোনভাবে শয়তানকে তাদের সঙ্গী করে নিলো। এটাই হচ্ছে সন্তান-সন্তুতিতে শয়তানের শরীক হওয়া। (ইবনু কাসীর)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আমার বান্দাদের একনিষ্ঠ একত্ববাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয় এবং হালাল জিনিসগুলোকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন যেন সে পাঠ করে ঃ

﴿ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ﴾

অর্থাৎ– "হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং তাকেও শয়তান হতে রক্ষা করুন যা আপনি আমাদেরকে দান করবেন।" এর ফলে যদি কোন সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে টিকে যায়, তবে শয়তান কখনো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ বলেন ঃ "হে শয়তান! যা, তুই তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক।" কিয়ামাতের দিন এই শয়তান তার অনুসারীদেরকে বলবে ঃ "আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ছিল সব সত্য, আর আমার ওয়াদা ছিল সব মিথ্যা।"

মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শারীয়াত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এরপর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দু'আ পাঠ করা উচিত– "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ-সজ্জা করি।"

তিনি আরও বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে।"

(ইবনু কাসীর)

সুলাইমান (আঃ) শয়তানকে দিয়ে যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শুরু করলেন

সুলাইমান (আঃ)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাঁকে বলে দেয়া হয় যে, তিনি যেন ওটা এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে লোহার শব্দও শোনা না যায়। সুলাইমান (আঃ) সদা চেষ্টা তদবীর চালাতে থাকেন, কিন্তু কারিগর খুঁজে পান না। অতঃপর তিনি শুনতে পান, সমুদ্রে একটি শয়তান রয়েছে যার নাম সখর। সে অবশ্যই এর নির্মাণ প্রণালী বলে দিতে পারবে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, যেভাবেই হোক তাকে আমার কাছে হাযির করা চাই। সমুদ্রে একটি ঝরণা ছিল। প্রতি সপ্তাহে এক দিন তাতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে আসতো। ঐ শয়তান এই পানিই পান করতো। ঐ ঝর্ণার পানি বের করে নেয়া হলো এবং ওটা সম্পূর্ণ খালি করে দিয়ে পানি আসার মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো। অতঃপর ঐ শয়তানের আগমনের নির্দিষ্ট দিনে ওটা মদে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। ঐ শয়তান এসে অবস্থা দেখে বললো– "এতো মজার জিনিসই বটে, কিন্তু এটা হলো জ্ঞানের শত্রু। এর দ্বারা অজ্ঞতার উন্নতি হয়।" সুতরাং সে পান না করেই চলে গেল। কিন্তু যখন কঠিনভাবে পিপাসার্ত হলো তখন এসব কিছু বলা সত্ত্বেও তাকে তা পান করতেই হলো। পান করা মাত্রই তার জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল এবং তাকে সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি দেখানো হলো অথবা তার দুই কাঁধের মাঝে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো। সুতরাং সে শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের মূলে ছিল এই আংটি। এই আংটির বলেই তিনি রাজ্য শাসন করতেন। এ শয়তানকে তাঁর দরবারে হাযির করা হলে তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। শয়তান এ কাজে বের হলো এবং হুদহুদ পাখীর ডিমগুলো এনে জমা করলো। অতঃপর ডিমগুলোর উপর শীশা (কাঁচ) রেখে দিলো। হুদহুদ এসে ডিমগুলো দেখলো এবং চার পাশে ঘুরলো। কিন্তু দেখলো যে, ওগুলো উদ্ধার করা যাবে না। তখন সে উড়ে চলে গেল ও হীরা এনে তা শীশার উপর রেখে শীশাকে কাটতে শুরু করলো। অবশেষে শীশা কেটে গেল এবং তার ডিমগুলো নিয়ে চলে গেল। ঐ হীরা নিয়ে নেয়া হলো তা দিয়ে পাথর কেটে কেটে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য শুরু করে দেয়া হলো।

ঘটনাটি বানী ইসরাঈলের বর্ণিত ঘটনা। এটি বানী ইসরাঈল ও আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ইবনু কাসীর)

শয়তানের সুলাইমান (আঃ)-এ সিংহাসন লাভের পরিণতি

তাফসীর ইবনু কাসীর হতে প্রমাণিত হয় ঃ সুলাইমান (আঃ) যখন পায়খানা বা গোসলখানায় যেতেন তখন তিনি তাঁর আংটি খুলে রেখে যেতেন। একদিন তিনি গোসলখানায় যাচ্ছিলেন এবং ঐ শয়তান তাঁর সাথে ছিল। ঐ সময় তিনি যাচ্ছিলেন ফরয গোসলের জন্য। আংটিটা তিনি ঐ শয়তানের কাছেই রেখে দেন। শয়তান তখন ঐ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং ঐ শয়তান সুলাইমান (আঃ)-এর রূপ ধারণ করে তাঁর সিংহাসনে এসে বসে যায়। সব জিনিসের উপর ঐ শয়তানের আধিপত্য লাভ হয়। শুধুমাত্র সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের উপর সে কোন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এখন ঐ শয়তানের শাসনামলে বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। ঐ যুগে সেখানে উমার (রাঃ)-এর ন্যায় একজন অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি বললেন, "এ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে যে, এ ব্যক্তি সুলাইমান (আঃ) নয়।" সুতরাং তিনি একদিন সুলাইমান রূপী ঐ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা জনাব! যদি কোন লোক রাত্রে অপবিত্র হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডার কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে তবে বুঝি কোন দোষ নেই?" সে উত্তরে বললো, "মোটেও না।" চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ছিল। অতঃপর সুলাইমান (আঃ) মাছের পেটে তাঁর আংটি প্রাপ্ত হন। আংটি পরামাত্রই সব কিছুই তাঁর অনুগত হয়ে যায়। এরই বর্ণনা এই (৩৪ নং) আয়াতে রয়েছে। (ইবনু কাসীর)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, সুলাইমান (আঃ)-এর একশ'টি স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজনের উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যার নাম ছিল জারাদাহ। যখন তিনি অপবিত্র হতেন বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করতে যেতেন তখন আংটি তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন। একদিন তিনি আংটিটা তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে পায়খানায় গিয়েছেন, পিছন হতে একটি শয়তান তাঁরই রূপ ধরে এসে তাঁর স্ত্রীর কাছে আংটিটা চায়। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন শয়তান আংটিটা নিয়েই সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়ে। তখন সুলাইমান (আঃ) পায়খানা হতে এসে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে তিনি বলেন, "এখনই তো আপনি আংটি নিয়ে গেলেন।" স্ত্রীর কথা শুনে সুলাইমান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, এটা তাঁর উপর আল্লাহর পরীক্ষা। সুতরাং তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও চিন্তিত অবস্থায় প্রাসাদ হতে বেরিয়ে পড়লেন। শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু হুকুমের পরিবর্তন দেখে আলিমগণ সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট আসলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, "ব্যাপার কি?" সুলাইমান (আঃ)-এর সত্তা সম্পর্কে আমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছি। যদি ইনি প্রকৃতই সুলাইমান (আঃ) হন তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা তিনি সুলাইমান (আঃ) নন। তিনি প্রকৃত সুলাইমান (আঃ) হলে কখনো এরূপ শারীয়াত বিরোধী আহকাম জারী করতেন না।" তাঁদের একথা শুনে তাঁর স্ত্রীরা কাঁদতে লাগলেন। ঐ আলিমগণ সেখান হতে ফিরে এসে সিংহাসনের চারদিকে ঐ শয়তানকে ঘিরে বসে পড়লেন এবং তাওরাত খুলে পড়তে

শুরু করলেন। আল্লাহর কালাম শুনে ঐ পাপিষ্ঠ শয়তান পালিয়ে গেল এবং ঐ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। ঐ আংটি একটি মাছ গিলে ফেললো।

ঘটনাটি বানী ইসরাঈলের বর্ণিত ঘটনা। এটি বানী ইসরাঈল ও আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ইবনু কাসীর)

সুলাইমান (আঃ)-এর হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়া

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ সুলাইমান (আঃ) তাঁর ঐ অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রের ধারে গমন করেন। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেখে তিনি তাদের কাছে একটি মাছ চাইলেন এবং নিজের নামও বললেন। তাঁকে তাঁর নাম বলতে শুনে জেলেদের একজন ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলে– দেখো, এ ভিক্ষা চাচ্ছে, আবার নাম বলছে 'সুলাইমান'! এ বলে সে তাঁকে মারতে মারতে ক্ষত বিক্ষত করে দিলো। আহত হয়ে তিনি সমুদ্রের এক কিনারায় গিয়ে নিজের ক্ষত স্থানের রক্ত ধুতে লাগলেন। জেলেদের কারো কারো মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তারা বললো, "কেন তুমি ভিক্ষুক বেচারাকে মারলে, যাও, মাছ দুটি তাকে দিয়ে এসো। সে ক্ষুধার্ত, ভেজে খাবে।" সুতরাং দুটো মাছ তাঁকে দিলো। মাছ দুটো পেয়ে তিনি রক্ত ও যখমের

কথা ভুলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি মাছ দুটো কাটতে বসলেন। আল্লাহর কি মহিমা! মাছের পেটে তিনি তাঁর ঐ আংটি পেয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং অঙ্গুলিতে ঐ আংটি পরে নিলেন। তৎক্ষণাৎ পক্ষীকুল এসে তাঁকে ছায়া দান করলো এবং ঐ লোকগুলো তাঁকে চিনে ফেললো। তারা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে সে জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, "এ সবই আল্লাহর কাজ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর এক পরীক্ষা ছিল।" অতঃপর তিনি তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বসলেন এবং নির্দেশ দিলেন, "ঐ শয়তানকে যেখানেই পাও সেখান থেকেই ধরে এনে বন্দী করে দাও।" সুতরাং তাকে বন্দী করা হলো। তিনি তাকে লোহার একটি সিন্দুকে ভরে তাতে তালা লাগিয়ে দিয়ে ওর উপর মোহর লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর ঐ সিন্দুককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। সে কিয়ামাত পর্যন্ত সেখানেই বন্দী থাকবে। তার নাম ছিল হাকীক।

সুলাইমান (আঃ) দু'আ করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী যেন আমি ব্যতীত আর কেউ না হয়।" তাঁর এ দু'আও ক্ববূল করা হয় এবং বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়। (ইবনু কাসীর)

মহান আল্লাহ বলেন, "শয়তানদেরকেও তাঁর অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।" তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ও লম্বা লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করতো যা মানবীয় শক্তির বহির্ভুত ছিল। আর তাদের

মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করতো। তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসতো। (ইবনু কাসীর)

ঘটনাটি বানী ইসরাঈলের বর্ণিত ঘটনা। এটি বানী ইসরাঈল ও আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ইবনু কাসীর)

জ্বিন ও শয়তান দূর করণে সুলাইমান (আঃ)-এর দু'আ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "এক দুষ্ট জ্বিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার নামায নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখবো, যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলাইমান (আঃ)-এর দু'আর কথা আমার মনে হয়ে গেল।" হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দুষ্ট জ্বিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে দেন। (বুখারী)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ أَعُوذُ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (আমি তোমার হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) তারপর তিনি বলেন, أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ (তোমার উপর আমি আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করছি।) একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে নিজের হাত প্রসারিত করেন যে, যেন কোন জিনিস তিনি নিতে চাচ্ছেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা নামাযে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম! (ব্যাপার কি?) তিনি উত্তরে বললেন, "আল্লাহর শত্রু ইবলীস জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্য এসেছিল। তাই আমি তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ বলেছি। তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও সে সরেনি। সুতরাং আমি তাকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম যাতে সকালে মাদীনার ছেলেরা তাকে নিয়ে খেলতে পারে। যদি আমার ভাই সুলাইমান (আঃ)-এর দু'আ না থাকতো তবে আমি তাই করতাম। (মুসলিম)

জ্বিন ও মানুষের বিবাহ

ইবনু আরাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জ্বিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্টই বিদ্যমান রয়েছে।

জ্বিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কিনা এতে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়িয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লেখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জ্বিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমান ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শারীয়াতে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রিওয়ায়াতে সুলাইমান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জ্বিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জ্বিন ছিল না।

وَخِتَامًا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٭

সবশেষে নবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা-